যুদ্ধ জয়ের গল্প এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা

ebi gyw³‡hv×v †gvt Rûi“j nK gÝx
ebi cZxK (2 evi)

স্বাধীন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতার ফসল। মুক্তিযুদ্ধে কেউ কেউ শহীদ হয়েছেন, আর কেউ হয়ে আছেন জীবন্ত কিংবদন্তি। এমনই এক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জহুরুল হক মুন্সী। যিনি একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দু'বার বীরপ্রতীক খেতাব পেয়েছেন। তাঁর যুদ্ধ জয়ের গল্প এবং বর্তমান নিয়ে... লিখেছেন **মহিউদ্দিন নিলয়**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকের ঘটনা। রাইন নদী অতিক্রম করে মূল জার্মান ভূ-খণ্ডে ঢুকে পড়ে মিত্র বাহিনী। তিন লাখ লোকের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন জার্মান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল ওয়াল্টার মোডেন। এ পরিস্থিতিতে আমেরিকান সেনাপতি জেনারেল ম্যাথ্যু রিজওয়ে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে চিঠি পাঠান জার্মান সেনাপতির কাছে। ওয়াল্টার মোডেন এ প্রস্তাব মেনে নেননি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, একজন জার্মান ফিল্ড মার্শাল কখনো আত্মসমর্পণ করতে পারে না। তিনি তাঁর অধীনস্তদের 'রিলিজ অর্ডার' দিয়ে নিজে আত্মহত্যা করেন। তবে ঐ পত্র পাঠানো ছিল আমেরিকানদের একটা যুদ্ধকৌশল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও ঘটেছে চিঠি চালাচালির ঘটনা।

৯ ডিসেম্বর ১৯৭১। জামালপুরে শক্তিশালী পাকবাহিনীর বাধার সম্মুখীন হয় মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর একটি ইউনিট। এমন সময় ব্রিগেডিয়ার হরদেব সিং ক্লের ঘোষণা করলেন, 'কে পারবে চিঠি নিয়ে পাকিস্তান ক্যাম্পে যেতে?' পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান সংবলিত বার্তা। ৪৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। সবাই যুদ্ধ করে মরতে চায়। কিন্তু চিঠি নিয়ে পাকিস্তানি শিবিরে যেতে রাজি নয়। ক্লের আবার ঘোষণা করলেন, 'কে আছো, মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করবে?' একজন ২৮ বছরের যুবক হাত তুললো। সাইকেলে সাদা পতাকা উড়িয়ে গিয়ে সে পৌঁছালো পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানে। পকেটে তার আত্মসমর্পণের বার্তা। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বার্তাবাহী শুনেই ক্ষেপে গেল ওরা। সাদা পতাকা দিয়ে চোখ বেঁধে ফেললো তার। কোমরের গামছা দিয়ে বাঁধা হলো হাত। জিপের পেছনের স্পেয়ার চাকার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো লে. কর্নেল সুলতান মাহমুদের কাছে। সুলতান এসএমজি-এর বাঁট দিয়ে ভেঙে ফেললো তার চারটি দাঁত। নির্দেশ দিল শায়েস্তা করতে। হিংস্র জানোয়াররা চীনা রাইফেলের বেয়নেট দিয়ে পা ঝাঁঝরা করে দিল। হাতে অনবরত সুঁই ফুটালো। কিছুই স্বীকার করলো না সে। শুধু বললো যে, সে এক গরিব কৃষক, ভারতীয়রা তাকে বাধ্য করেছে। সে সময় পাকিস্তানি ক্যাম্পে দোভাষীর কাজ করছে জামায়াত নেতা কামরুজ্জামান। কিন্তু কেউই কোনো কথা বের করতে পারলো না। ৮-১০ ঘন্টা অত্যাচারের পর চিঠির উত্তরসহ ছেড়ে দেয়া হলো তাকে। চিঠির ভেতর দিয়ে দিল ৭.৬২ মি.মি. একটি গুলি। এদিকে সবাই যখন আশা ছেড়ে দিয়েছিল তখনই ফিরে আসে অকুতোভয় যোদ্ধা। পাকিস্তানি ক্যাম্পের অবস্থান নিশ্চিত করে। পরদিনই হামলা চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয় পাকিস্তানি ক্যাম্প। পথে লাশের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিশোধের নেশা মেটালো সেই সাহসী সূর্য সন্তান। মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯ মাস ধরে দুর্বার গতিতে যুদ্ধ করেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের বীরগাথা এ নায়কের নাম মোঃ জহুরুল হক মুন্সী বীর প্রতীক (২ বার)।

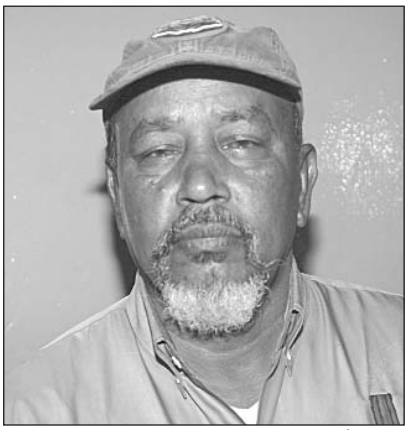

মুন্সী এখন বাস করেন শেরপুরের শ্রীবরদী গ্রামে। স্ত্রী, তিন ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে তার সংসার। শ্রীবরদী থেকে মাঝে মধ্যেই ঢাকায় আসেন। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যালয়ে গিয়ে পুরনো বন্ধুদের খোঁজখবর নেন। এ রকম এক সময়েই তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতা হয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদকের। দীর্ঘ আলাপচারিতায় জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা ইতিহাস। ষাটোর্ধ্ব বয়সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেন, তাঁর যুদ্ধ জয়ের কাহিনী।

জহুরুল হক মুন্সী তখন নারায়ণগঞ্জের সোনাকান্দায় ডক ইয়ার্ডে কাজ করেন। শ্রমিক লীগেরও সক্রিয় কর্মী তিনি। '৭১-এ মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে অসহযোগ আন্দোলনে প্রবল উৎসাহে যোগদান করতে কর্মস্থল থেকে ঢাকায় ছুটে আসতেন নিয়মিত। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান শুনে যেন যুদ্ধ প্রস্তুতি নেয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল তাঁর।

"নারায়ণগঞ্জ থ্যাইকেই আমি মুক্তিযুদ্ধে দুই নম্বর সেক্টরে যোগ দেই। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর হায়দার। প্রথম দিকে কামরুল হাসান ভুঁইয়াসহ আমরা আরো অনেকে নারায়ণগঞ্জের জিমখানা, চাষাঢ়া এলাকায় যুদ্ধ করছি," বললেন তিনি।

নারায়ণগঞ্জ থেকে যুদ্ধ করতে করতে

পানামনগর সোনারগাঁও। ওখান থেকে পরবর্তীতে কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বা নৌকায় চড়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে জামালপুর সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জে যান। ওখানে অস্ত্র চালনার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ নেন গেরিলা যুদ্ধের। তারপর ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে ঝাঁপিয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে। একের পর এক বীরত্ব প্রদর্শন করতে থাকেন তিনি। কখনো সশস্ত্র মহড়ায় আবার কখনো ছদ্মবেশে হামলে পড়েন। "মুক্তিযুদ্ধে আমি চাইর হাজার লোক মারছি। হের মইধ্যে পাকিস্তানি সৈন্য যেমন ছিল, তেমনি আল-বদর রাজাকারও ছিল, মন্দ লোক ছিল," বললেন মুন্সী। তিনি আরো জানান, মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে নভেম্বরে বৃহত্তর জামালপুরের কামালপুরে এক দুর্দান্ত অ্যাকশনে তারা পরাস্ত করেন পাক বাহিনীকে। "কামালপুরে আমরা ২১ দিন টানা যুদ্ধ করছি। এই যুদ্ধেই আমি পাকিস্তানি মেজর আইয়ুবকে নিজ হাতে খতম করি।" ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের প্রথম মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি (এমএনআই)-এর সদস্যও ছিলেন তিনি। সম্মুখ যুদ্ধের পাশাপাশি কৌশলগত যুদ্ধেও বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন মুন্সী। তিনি নিজেই বর্ণনা দেন তার সাহসী ঘটনার। "গাইবান্ধা ট্রেজারিতে ৪০টা কলা নিয়া আমি গেছিলাম পাকিস্তানি ক্যাম্পে। ৩০টার মধ্যে পয়জন মিশাইয়া নিছি আর ১০টার ভিতর চুন দিয়া চিহ্ন দিছিলাম। তেলডালার জিয়াউর রহমান ছিল তখন আমাদের কমান্ডার। এটা জেড ফোর্সের। মানিকারচরে আমারে নিয়া গেল। গাইবান্ধার ঢাকর নদীতে একটা ব্রিজ ছিল, মানে সুয়েজ গেট। ঐটা আমরা ভাঙতে গেছিলাম। আংশিক ক্ষতি করতে পারছিলাম। তবে আমরা যা রেকি কইরা গেছি ঐ অনুসারে হিসাব মিলাইতে পারি নাই। ১০ ফুটের মতো ব্রিজ আমরা ক্ষতি করতে পারছি যাতে গাড়ি না আসতে পারে। ঐটা স্টিল ব্রিজ ছিল। তখন আমাদের ১১ নম্বরের পাশেই ছিল তেলডালা। যেইখানে জেড ফোর্স ঘাঁটি করছিল। জিয়াউর রহমান আমারে বললো, 'তুমি যেহেতু গেরিলা কমান্ডার তাই তোমাকেই যেতে হবে।' উনি আমারে ২ হাজার টাকা দিছে। টাকা দিয়া বলছে, 'তুমি এই অপারেশন না কইরা আমার সঙ্গে দেখা করবা না।' এইটা নবেম্বরের ২৭/২৮ তারিখের কথা। আমি কলা লইয়া পাকিস্তানি ক্যাম্পে গেলাম। ওরা আমারে খাইতে কইলো। আমি চুন দেয়া ২/৩টা খাইয়া ফেললাম। এরপর ওরা আমারে টাকা না দিয়া টর্চারিং কইরা ছাইড়া দিল। পরে জিয়াউর রহমান ইনকোয়ারি কইর‍্যা দেখছে, ওরা ২৭/২৮ জন কলা খাইয়া মরছে। আমি ওগোরে কলা খিলাইয়া মারতে পারছি। এই জন্য জিয়াউর রহমান আমারে ৫ হাজার টাকা রিওয়ার্ড দিছে।" মাইন বিস্ফোরণেরও প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন মুন্সী। পাকিস্তানিদের যুদ্ধবহর যাওয়ার রাস্তায় জীবনবাজি রেখে মাইন ফেলে আসতেন। কিছুক্ষণ পরই সেখানে ধ্বংসস্তূপ তৈরি হয়ে যেতো।

লে. কর্নেল সুলতান মাহমুদকে ব্রিগেডিয়ার হরদেব সিং ক্লের চিঠি

কমান্ডার, *জামালপুর গ্যারিসন*

আমি নির্দেশিত হয়ে আপনাকে জানাচ্ছি যে, আপনার গ্যারিসন চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে এবং পালাবার কোনো পথ আর আপনার নেই। আর্টিলারির সমস্ত অনুষঙ্গসহ একটি ব্রিগেড অবস্থান নিয়ে আছে এবং আরেকটি প্রস্তুত হয়ে যাবে আগামীকাল ভোরের মধ্যে, এরই মধ্যে আমাদের বিমানবাহিনীর ছোট একটি বহরের পূর্বস্বাদ আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং আরো বহু আসছে। পরিস্থিতি আপনার জন্য নৈরাজ্যকর। আপনার ঊর্ধ্বতন কমান্ডাররা আপনাকে ইতিমধ্যে ডুবিয়েছে।

আমি আজ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটের মধ্যে আপনার জবাব আশা করছি। অন্যথায় আমি চূড়ান্ত আক্রমণ করতে বাধ্য হব যার জন্য মিগ বিমানের ৪০টি সর্টি আমার সাহায্যে দেয়া হয়েছে।

আজ সকালের যুদ্ধে আপনার যে সৈন্যদের আমরা বন্দি করেছি তারা আপনার জনবল এবং অবস্থান আমাদের জানিয়েছে এবং তাদের ভালোভাবে দেখাশোনা করা হচ্ছে।

আমি আশা করি, এই বেসামরিক বার্তাবাহকের সঙ্গে ভদ্রতাসুলভ ও সম্মানজনক আচরণ করা হবে এবং তার কোনো ক্ষতি করা হবে না।

ব্রিগেডিয়ার এইচ এস ক্লের
কমান্ডার, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১

ব্রিগেডিয়ার ক্লেরকে লে. কর্নেল সুলতান মাহমুদের জবাব

জামালপুর, *০৯১৭৩৫ ডিসেম্বর*

প্রিয় ব্রিগেডিয়ার,
আশা করি এ চিঠি যখন পাবেন তখন আপনার মনোবল উঁচুতে। আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। জামালপুরে আমরা যুদ্ধ শুরুর অপেক্ষায় আছি। যুদ্ধ কখনো শুরু হয়নি। কাজেই বাক্যব্যয় না করে যুদ্ধ শুরু করা যাক।

আমার মনে হয় ৪০টি সর্টি যথেষ্ট নয়। আরো সর্টি চেয়ে পাঠান।

বার্তাবাহকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য বাহুল্য। বোঝা যায়, আমার সৈন্যদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কত নিচু। আশা করি আমাদের দেয়া চা তার ভালো লেগেছে। মুক্তিবাহিনীকে আমার ভালোবাসা দেবেন।

আশা করি যখন দেখা হবে তখন আপনার হাতে কলমের বদলে থাকবে স্টেন, যার ওপর আপনার ধারণা আপনি বেশি পারদর্শী।

আপনার অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ
কমান্ডার জামালপুর, নগরদুর্গ

বঙ্গবন্ধুর ডাকে যুদ্ধ করেছেন, আবার যুদ্ধ শেষে তাঁর আশ্বাসে ফিরে গেছেন নিজের কাজে। মুন্সীর জবানিতে, "বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমরা ১৬ হাজার অস্ত্র জমা দিছিলাম ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজে। কর্নেল তাহের, মেজর আজিজ, হামিদুল্লাহ খানসহ আরো অনেকে অস্ত্র জমা দেই। ঐদিকে কাদের সিদ্দিকী অস্ত্র জমা দিছিল টাঙ্গাইলে। কিন্তু রাজাকার আল-বদরের অস্ত্র এই দেশে নেয়া হয় নাই।" এরপর জহুরুল হক মুন্সী চট্টগ্রামে ডক ইয়ার্ডে কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধু বলছেন দেশ গড়ার কাজ করতে। আমি যেখানে চাকরি করি সেখানেই তো আমার দেশ গড়ার কাজ। ওখানে আমরা বাংলাদেশের প্রথম ছয়টা নৌবাহিনীর জাহাজ তৈরি করছি। সেখানে একজন লেফটেনেন্ট কমান্ডার ছিলেন যার নাম এমএস কবীর। তিনি এখন চট্টগ্রামে নৌ-বাহিনীর প্রধান।" এরশাদ সরকারের সময়ে তার এই চাকরিটা চলে যায়। তবু স্বৈরাচারের সঙ্গে আপস করেননি। আজ তার বড় দুঃখ হয় এ দেশকে নিয়ে। যে স্বপ্ন বা আশা নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন, তা পূরণ হয়নি। পাকিস্তানিদের দোসর রাজাকার-আল-বদররা আজ তার স্বাধীন দেশের ক্ষমতায়। এটা চোখে দেখে কষ্ট পান তিনি। বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন সিদ্ধান্তটাকে জাতির জন্য বিরাট ভুল বলেও মনে করেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বলেন, "আমরা বঙ্গবন্ধুর কাছে দাবি করছিলাম, তুমি চাবুক হাতে নিয়ে বইস্যা থাকো আর দেশটারে পাঁচ বছরের জন্য ওসমানীর কাছে ছাইড়া দাও। আমরা সব আগাছা নির্মূল করবো।" মুন্সী আরো বলেন, "আমরা সাধারণ ক্ষমার প্রতিবাদ করায় বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তোমরা যদি বাড়িতে চইল্যা না যাও, তাহলে আমি লাল ঘোড়া দাবড়ামু। তোমরা যুদ্ধ করছ, যুদ্ধ শেষ। এখন দ্যাশ গড়ার পালা। তোমরা যার যার বাড়িতে চইল্যা যাও। বাপ-মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। আমরা প্রয়োজনবোধে তোমাদের ডাকবো।" বঙ্গবন্ধুর এই ডাক যথার্ত ছিল বলে মনে করেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বলেন যে যুদ্ধের পর যে যেখান থেকে এসেছিল তাকে সেখানেই ফেরত পাঠানো উচিত ছিল। তাহলে দেশ গড়ার কাজ এগিয়ে যেতো। যারা স্কুল-কলেজ থেকে গেছে তাদের লেখাপড়ার জন্য স্কুলে দেয়া উচিত ছিল। শ্রমিকদের শ্রমিকের কাজে রাখা উচিত ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর ভাষায়: "যারা চোর, গুন্ডা-বদমায়েশ ছিল, মুক্তিযুদ্ধে গেছিল, তাদেরকে তো শায়েস্তা করা উচিত ছিল।"

যুদ্ধাপরাধীদের প্রসঙ্গে মুন্সী বলেন, "এদেরকে তো আর মারা যাবে না। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা। রাশিয়ান ইতিহাস বা জাপানের ইতিহাসে দেখা গেছে যারা ক্রিমিনালি করলো তাদের মাইরা গণকবর দেয়া হইছে এবং শহীদ হিসেবে তাদের বাপ-মাকে ভাতা দেয়া হইছে।' বিনা বিচারে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ভারতীয়দের হাতে তুলে দেয়ায়ও

তার ভেতর ক্ষোভ আছে। 'পাকিস্তান তাগোর ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়া গেলোগা ইন্ডিয়ার গ্রুতে। এদিকে এই একটা ভুল করছে। কারণ তারা তো আমাগো মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সারেন্ডার করছে। আমি সে দিন রেসকোর্সের ময়দানে উপস্থিত ছিলাম।' মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরপরই ঢাকায় অরাজক অবস্থা সম্পর্কে বললেন মুন্সী। 'মারাঠা ফার্স্ট ব্যাটালিয়ান ৯৫ মাউনটেন ব্রিগেড আমি পরিচালনা করছি। আমার দলডা নিয়া কয়েকটা যুদ্ধে জয়লাভ করছি। ১৬ তারিখ বেলা ২টার সময় আমরা সাভার দিয়া ঢাকা ঢুকছি। ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনের সামনে ওরা কাউন্টার ফাইট দিয়া আমাগো মারাঠা ব্যাটালিয়ানের ২ জন ভারতীয় সৈন্য মাইরা ফেলছে। আমি প্রেসিডেন্ট ভবন দখল কইর‍্যা ঐডার মধ্যে ১৭ দিন স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট ছিলাম। আমি নিজেই ডিক্লেয়ার দিছি। বঙ্গবন্ধু তখনো দেশে আসে নাই। পূর্বাণী হোটেল থেইক্যা আমার পুরা ব্যাটালিয়ানের খাবার আইতো। তখনো ভারতের কয়েকটা অফিসার বাঁইচ্যা আছে যারা আমার টিমে ছিল, যেমন ব্রিগেডিয়ার পানওয়ার।" তিনি দাবি করেন যে '১৬ তারিখ থেইক্যা জানুয়ারির ৯ তারিখ পর্যন্ত' তিনি বাংলাদেশের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন। "দেশে বড় লিডার তখনো কেউ আসে নাই। আমি সারা দেশে কার্ফ্যু দিছি নিজের ইচ্ছায়। লুটতরাজ যাতে না হইতে পারে। ক্যান্টনমেন্ট থেইক্যা ৩০০ মেয়েছেলে বাইর করছি কাপড় দিয়া। আনোয়ার নামে একটা কাপড়ের স্টল ছিল। ব্রাশফায়ার দিয়া তালা ভাইঙ্গা কাপড় বাইর করছি। যেই চেয়ারে আইয়ুব খান বসতো ঐখানে আমি বসছি। আমার চিন্তা হইলো বঙ্গবন্ধু তো দেশে আইস্যা এইখানে বসবো। ঐখানে আমি কোনো ভারতীয়দের বসতে দিমু না। সারা দিন চেয়ারে বইস্যা থাকতাম। চেয়ারেই ঘুমাইতাম। ইন্ডিয়ানরা মনে করছে আমি পাগল হইয়া গেছি। হাজার হাজার পাকিস্তানি সৈন্য মাইরা আমার মাথা নষ্ট হইয়া গেছে। আমার দলে ভারতের মেজর নাগরা ছিল। ব্রিগেডিয়ার শমসের ছিল। তাদের কাউকেই আমি চেয়ারে বসতে দেই নাই। তারাও আমারে সম্মান করতো। তারা কইতো, 'মুন্সী পাগল হইয়া গেছে। যেকোনো সময় আমাদের উপরও গুলি করতে পারে। ওরে কিছু বলার দরকার নাই।'

"ঢাকার তখন লুটতরাজ শুরু হইছিল। লুটতরাজ দমানোর জন্য আমি সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কার্ফ্যু ঘোষণা দিছি। এ সময় যারে পাইছি গুলি কইরা মারছি। মাইরা রাইতের বেলায় কোনো ট্রাকে কইরা নিয়া বুড়িগঙ্গায় ফালাইছি।"

দেশে এখন স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক চলছে। এ প্রসঙ্গ উঠতেই ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি বলেন, 'শাজাহান সিরাজের মতো মুক্তিযোদ্ধারা এখন স্বার্থের জন্য মিথ্যাচার করে। আতাঁত করে রাজাকারদের সঙ্গে। জানা সত্যকে ঘুরিয়ে বলে।' এসব মুন্সীকে খুব পীড়া দেয়। দেশের এতো বড় অর্জন মাঝে মাঝে কিছুই মনে হয় না তাঁর কাছে। জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন তিনি। তাঁর মতে, 'স্বাধীনতার ঘোষণা দিছেন বঙ্গবন্ধু। জিয়াউর রহমান যেইটা করছে সেইটা তো তার আগেই করছে এমএ হান্নান।' মুন্সীর সঙ্গে একই সেক্টরে যুদ্ধ

GLbI `'†Pv‡L ¯c ‡b‡q N‡i †eov‡b g‡³h‡×i GB mvnmx exi

করা কর্নেল আকবর হোসেন এখন যেসব কথাবার্তা বলছেন তা শুনে মুন্সীর রাগ উঠে যায়। এদেরকে দেশের মীরজাফর বলে অভিহিত করেন তিনি। তাঁর ভাষায়, 'এখন যারা রাজনীতি করেন তারা টাকার অঙ্কে রাজনীতি করে না। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজনীতি ছিল ছয় দফা, না হয় এক দফা।' তিনি আরো বলেন, 'এখন শিল্পপতির কাছে রাজনীতি। দেশপ্রেমীদের হাতে পয়সা নাই, দুই নম্বরি লোকজনের দাপট।' রাগে-দুঃখে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'গণতন্ত্রই এই জাতির জন্য প্রযোজ্য ছিল না। স্বাধীনতার পরে সরকাররা স্বাধীনতার মর্যাদা রাখার ট্রেনিং নেয় নাই। কিভাবে গদি রাখব খালি সেই চিন্তাই করছে।'

মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের কথা ভেবে দু'বার বীর প্রতীক উপাধি দেয়া হয়েছে তাকে। এ সম্মান তাকে গর্বিত করে। অধিকাংশ সময় তাই শার্টে ঝুলিয়ে রাখেন তার অর্জন সোনার মেডেল। স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ী এ বীর সংসার যুদ্ধে বড় ক্লান্ত। দেশকে নিয়ে খুব ভাবেন। গভীরভাবে স্বপ্ন দেখেন। 'যুদ্ধজয়ী প্রতিটি দেশেরই সময় লাগছে, আমাদেরও লাগবো। তবে একদিন ঠিকই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা বিকশিত হইবো এই দেশ।'

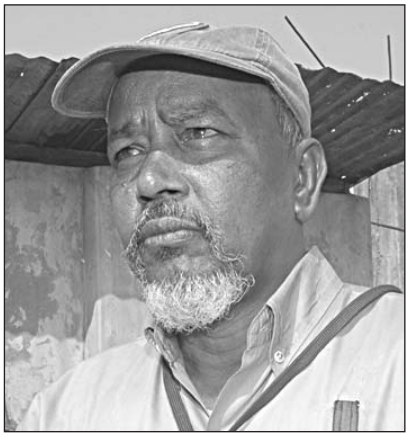

মোঃ জহুরুল হক মুন্সীকে প্রথম মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল কে এস ব্রার-এর দেয়া প্রত্যয়নপত্র

১. এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ জহুরুল হক মুন্সী, পিতা- মোঃ আব্দুল গফুর মিয়া, গ্রাম-চন্দ্রাবাজ, থানা- শ্রীবরদি, জেলা- ময়মনসিংহ, মুক্তিযোদ্ধা ইন্টিলিজেন্স কমান্ডার, প্রথম মারাঠা লাইট ইফ্যান্ট্রির সঙ্গে ৮ নবেম্বর ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত করেছেন।

২. ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি পাকসেনা হত্যা, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সমরসম্ভার ধ্বংসের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অপারেশনসমূহে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। এসব অপারেশনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৪ নবেম্বর '৭১-এ বকশীগঞ্জ-কামালপুর সড়কে এক অ্যাম্বুশে ৪টি পাকিস্তানি ১২০ মি.মি. মর্টার এবং ৬টি গাড়ি ধ্বংস ও বহুসংখ্যক পাকসেনা হত্যা।

৩. যুদ্ধ শুরু হলে মুন্সী ব্যাটালিয়নকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে বকশীগঞ্জ এবং কমলাপুরে শত্রুর নির্বাচিত প্রতিরক্ষা অবস্থানের পশ্চাতে পথ প্রদর্শন এবং পরবর্তী সময়ে দক্ষিণমুখী ঢাকা অগ্রাভিযান শত্রু সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্যাদি সংগ্রহে তার সহায়তা ছিল উল্লেখযোগ্য।

৪. মুন্সীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানটি হচ্ছে, ৯ ডিসেম্বর '৭১-এ নিজ প্রাণ বিপন্ন করে আমাদের কমান্ডারের কাছ থেকে আত্মসমর্পণের আহ্বানসংবলিত একটি পত্র পাকিস্তানিদের জামালপুর সেনা ঘাঁটির কমান্ডারের কাছে পৌঁছে দেয়া। এ ব্যাপারে তাকে অস্ত্রবিহীন অবস্থায় একাকী পাকিস্তানি শিবিরে যেতে হয়েছিল এবং পাকিস্তানি ঘাঁটি কমান্ডারের কাছে পৌঁছার পর যথারীতি লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হতে হয়েছিল। অবশেষে তিনি জামালপুর ঘাঁটির পাকিস্তানি কমান্ডারের লিখিত জবাবটি নিয়ে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে ফেরত আসতে সক্ষম হন।

৫. আমাদের সঙ্গে কাজ করার সময় মোঃ জহুরুল হক মুন্সী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সাহস, উদ্যম ও একাগ্রতা প্রদর্শন করেন। আমাদের কাছে তিনি সব সময় ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং তার শৃঙ্খলাবোধ ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি ব্যাটালিয়নের সর্বস্তরের সৈনিকদের কাছে ছিলেন জনপ্রিয়।

৬. আমরা তার ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর সাফল্য কামনা করি এবং আস্থা রাখি যে, তিনি অপারেশনসমূহে যে ধরনের উচ্চমানের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন, বাংলাদেশের পুনর্গঠনের প্রয়োজনেও তা প্রদর্শন করবেন।

কে এস ব্রার
লে. কর্নেল
কমান্ডিং অফিসার, প্রথম মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি
প্রযত্নে : ৯৯ আর্মি পোস্ট অফিস, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২